নিহতের সংখ্যা

অমর মিত্র

ঠিক এই জায়গায় বসে পান চিবোতে চিবোতে গল্প করছিল বিমলেশ, গত বছর ও বিয়ে করেছিল, নৈহাটির দিকে একটা জুটমিলে তখন কাজ করত।

আজ সে কাজে যায় নি? জিজ্ঞেস করল সুকুমার।

আজ্ঞে না, কাজে গেলে তো ওই সময়ে ওর এখানে বসার কথাও নয়, বিনীতভাবে জালানো রবিন।

যায় নি কেন? প্রশ্নটা করেই সুকুমার বুঝল তার কৌতূহলের কোনো অর্থই হয় না। কারণ থাকতে পারে।আর এখন তো বছরের শেষ। এই সময়ে বকেয়া ছুটি নিয়ে মানুষ কিছু না করলেও ঘরে বসে পান চিবোয়। তার সে উপায় নেই। চাকরিতে ক্ষমতার অধিকারী হলে, দায়িত্ব বাড়লে মানমর্যাদা বাড়লে এসব কিছু কিছু ছাড়তে হয়। তবুও সে নিয়েছে। কালই ভোরে তো সপরিবারে ঝাড়গ্রাম যাবে। একটু জায়গা বদল, হাওয়া বদল, শীতের রোদ বদল। বিমলেশ পাল হয়তো সেই রকম ছুটিই নিয়ে ঘরে বসেছিল। কিন্তু সরকারি অফিসের মতো কলকারখানায় কি ওই সুযোগ থাকে? ছুটিতে কাজ করলে তো পয়সা। রবিন বলল, আজ্ঞে ওর জুটমিল বন্ধ হয়ে আছে ছমাসের উপর, টুকটাক অন্য কাজ করছিল।

সেই কাজে যায় নি? সুকুমার তার পেশাগত অভ্যাসে জেরা করে যেন রবিনকে, রবিন বোধহয় তার অধঃস্তন কর্মচারী। অফিসে কাজের মানুষ বলে সুকুমার দত্তর খুব খ্যাতি। দত্তসায়ের কাজ তুলে নিতে পারে কৌশলে।

একটা কাজ তো ইস্কুলে ইস্কুলে খাতা, পেনসিল, রিফিল, ডটপেন, প্যাড ইঙ্ক সাপ্লাই করা, তা তো সবসময় হয় না, আর এখন তো ইস্কুল বন্ধ বড়দিনের ছুটি চলছে।

এই কাজ! বিস্ময় প্রকাশ করে সুকুমার। এই কাজ করে দুপুরে কেউ নিশ্চিন্ত ভাবে পান চিবোতে পারে? না, না, এই কাজ নয়, ওর মা-বউ বাড়িতে বসে শায়া- ব্লাউজ সেলাই করত, শাড়িতে ফলস লাগাতে, ও অর্ডার আনত, মাল পৌঁছে দিয়ে আসত শ্যামবাজারের দোকানে দোকানে।

আজ শ্যামবাজার যায়নি? প্রশ্নটা করেই সুকুমারের মনে হল সে বোধহয় মুল ঘটনা থেকে সরে যেতে চাইছে। কী কাজ করত কেন কাজে যায় নি শ্যামবাজারে গিয়েছিল কিনা এসব কথা তো অবান্তর, সে ঘুরে জিজ্ঞেস করল, কেমন দেখতে বলো দেখি?

আপনি চিনতেন সুকুমারদা, আপনার কাছে দুবার নিয়ে গিয়েছিলাম, প্রথমবার ও একা গিয়েছিল।

কেন? সুকুমারের ভ্রুতে ভাঁজ পড়ে। ও মার্কশিট সার্টিফিকেট অ্যাটেসটেড করাতে গিয়েছিল, আপনি বলেছিলেন...। থেমে যায় রবিন।

কী বলেছিলাম?

আজ্ঞে বিরক্ত হয়েছিলেন, তো হতেই পারেন, সকাল সন্ধে যদি ওইজন্য যায় পাবলিক, আর আপনি তো ওকে চিনতেনই না, তাই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

কবে বলো দেখি?

তা বছর খানেক আগে, শেষে আমি নিয়ে গেলাম, হয়ে গেল।

হাসল সুকুমার, এইরকম অ্যাটেসটেড করা তো রিস্কি যদি ফলস মার্কশিট হয়, চেনা না হলে করাই ঠিক না, তাই।
মলিন হাসি রবিনের মুখে, তা তো জানি, আমাকে দেখেই তো করে দিলেন, কিন্তু ক্যারেকটার সার্টিফিকেটটা হয় নি, আমি বলতেও না,
কী বলেছিলাম?
কম করে পাঁচ বছর না চিনলে দিতে পারবেন না। বলতে বলতে রবিন তার ময়লা সোয়েটার টানতে থাকেনিচের দিকে জামার হাতা এমনিই ঝাড়তে থাকে। অন্ধকারে ধুলো ওড়ে কিনা ধরা যায় না, তবে খুব ময়লা হয়েছে রঙজ্বলা চেকশার্টটা তা দেখেই ধরা যাচ্ছে। পায়ে চটি। চটিটা একবার খুলে পায়ের নিচে ঢোকা কাপড়ের কুচি সারিয়ে দিতে থাকে রবিন, ওরা তো মাত্তর চার বছর এসেছে এখানে, তা শুনেই দেন নি, না হলে দিতেন।
মাথা দোলায় সুকুমার, হ্যাঁ, অচেনা কাউকে ক্যারেটটার সার্টিফিকেট তো দেওয়া যায় না, তুমি হলে তো কোনো ব্যাপার না, ঠিক কেমন দেখতে বলো দেখি, তুমি তো প্রায়ই একে - ওকে ধরে নিয়ে যাও মার্কশিট অ্যাটেসটেডকরাতে। রবিন বোঝাতে চেষ্টা করে, তারই মতো হাইট, তার চেয়ে একটু রোগা, গলাভাঙা। রবিনের চোখে চশমা,বিমলেশের চোখে চশমা ছিল না, রবিনের মতোই মাথায় অনেক চুল, একটা পা সামান্য টেনে হাঁটত। ওরা আগেবিরাটির দিকে থাকত। ওর বাবা মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকরি করতেন, শেষে কবছর খুব ভুগেছিলেন, চিকিৎসা করেসর্বস্বান্ত। শেষমেশ আধা কমপ্লিট বাড়িটা বিক্রি করে কলকাতায় চলে এসেছিল বিমলেশ আর ওর মা। বাড়ি না বিক্রি করলে লোন শোধ হত না, বাকি টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখেছিল কিছুদিন, এই ছমাসে মিল বন্ধ হতে ব্যবসা করতে আর খেতে তা প্রায় শেষ, ওর একটা চাকরি হতে হতে হয় নি।
কোথায়?
স্টেস ট্রানসপোর্ট, সে অনেক কথা। অধীর সরখেলবাবুদের একতলায় দেড়খানা ঘর নিয়ে থাকত বিমলেশরা, ওই যে ভুতনাথ বাইলেনে, গেছেন?
সুকুমার চুপ করে থাকে। ভূতনাথ বাইলেন তার বাড়ি থেকে কয়েকটা বাড়ি পরেই বাঁদিকে। খুব ঘিঞ্জি, পুরোনো বাড়ি অন্ধকার হয়ে থাকা গলি। ওই রাস্তাটা দিয়ে শর্টকাট করা যায় ট্রাম ডিপোয় যেতে। গলির শেষে ট্রাম ডিপোর পাঁচিল, পাঁচিলের মাঝখানটা গোল করে ভাঙা। মানুষ অনায়াসে গলে যেতে পারে। এখন সুকুমার ট্রাম ধরতে হলেও সোজা রাস্তা দিয়ে যায়। বাসেট্রামে আর ওঠেই-বা কখন? অফিসের গাড়ি নিয়ে যায় নিয়ে আসে। আজ কাজ ছিল একটা। ড্রাইভারকে শ্যামবাজারে ছেড়ে দিয়ে কাজ সেরে বাসে উঠে তিনটে স্টপেজ, রেলব্রিজ পার হয়ে বেলগাছিয়ায়। মোড় থেকে মাংসের দোকনের কাছে রবিন তাকে খবরটা দিয়েছে। আজ দুপুরে ডাকাতের গুলিতে এ-পাড়ার ছেলে বিমলেশ পাল মারা গেছে। চমকে উঠেছিল সুকুমার। এই রকম ঘটনা তো খবরের কাগজের পাতায় দেখা যায়। বেলগাছিয়ায় কোনো দিন ঘটেছে বলে শোনা যায় নি। এ-পাড়াটা তো নিস্তরঙ্গ। রাতবিরেতে মদ্যপের হল্লা গান ব্যতীত অস্বস্তিকর কোনো ঘটনাই তো এখানে সচরাচর ঘটে না। তিরিশ বছর ধরে এলাকাটা একই রকম। নতুন কোনো বাড়ি ওঠে নি, ভাড়াটে বাড়ির ভাড়াটেও বদল হয়নি প্রায়। সুকুমাররা যে বাড়িতে আছে তা কেনা হয়েছিল বছর পঁয়ত্রিশ আগে। সুকুমার তার নিজস্ব অংশ ভেঙে প্রায় নতুন করে নিয়েছে। শরিকি অংশ, কাকাদের দুভাগআগের মতোই জীর্ণ। আরো মলিন হচ্ছে। ডাকাতকে আটকাতে গিয়ে মারা গেছে বিমলেশ পাল। সুকুমার এ - পাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা, চেষ্টা করছিল মুখটা মনে করতে। সে পানের দোকানটা দেখল, এখন বন্ধ, এই দোকানেই বসেছিল ছেলেটা।
রবিন তার শার্টের হাতার বোতাম লাগাতে লাগাতে বলে, তখন তো খোলা ছিল, ঘটনার পর উৎকলবাসী অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সুকুমারদা। তার চোখের সামনেই তো ঘটল সব।
সুকুমার দেখছিল দুপুরে ঘটে যাওয়া হত্যা কাণ্ডের ছায়া যেন সরে গেছে এলাকায় উপর থেকে। কোনো চিহ্নই নেই। যেন দিনের আলোর সঙ্গে করে নিয়ে গেছে তা পশ্চিম আকাশে। ওই তো আব্দুল বুড়োর মাংসের দোকান খুলেছে। দোকানের কয়েকহাত দূরে ফুটপাতের প্রান্তে দুটি বাদামী রঙের পথের কুকুর পাশাপাশি বসে হাঁ করে তাকিয়ে আছে ঝোলানো মাংস খণ্ডের দিকে। সব বিক্রি হয়ে গেছে বা দোকান বন্ধের সময় হাড়ের টুকরো, জলে ধোয়া রক্ত ওরা পায়। বুড়ো আব্দুল দোকানের ধারে হাতলওয়ালা চেয়ারে পা তুলে একটু জবুথবু হয়ে বসেল ঝিমোচ্ছে। আজ শীতের হাওয়া দিচ্ছে। সুকুম

ারের সামনে রবিন তার শার্টের কলার দুটি এক করে চেপে ধরছে ঠাণ্ডা আটকানোর জন্য। কলারের বোতাম বোধহয় নেই। রবিন বলছে পথে সুকুমারদার সঙ্গে দেখা না হলে সে তার বাড়ি গিয়েসব জানিয়ে আসত। সুকুমার দেখছিল কালো অ্যাসফল্টের রাস্তা প্রতিদিনের মতোই স্বাভাবিক। লোকজন এপারেআসছে ওপারে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে হর্ন মারতে মারতে লরি ম্যাটাডোর ট্যাক্সি বাস মিনিবাস রাস্তার ও-ধারের বাঁক থেকে ঘুরে যায়। তার মনে হচ্ছিল অন্যদিনের চেয়েও এই রাস্তার ব্যস্ততা যেন বেশি। ওপারের মিষ্টি দোকানের খদ্দেরভরতি, চায়ের দোকানের বেঞ্চি ফাঁকা নেই। বড় ঝুড়ি নিয়ে শীতের কপি টম্যাটো বসেছে আধো অন্ধকারে। ধুলোমলিন কদমগাছটি অন্ধকারে আরো অন্ধকার। রবিন তাকে দুপুরের ঘটনা আবার বলছিল। সুকুমার কিছু শোনে, কিছু শোনে না। যেটুকু তার কানে যায় তা বোধহয় সুকুমার আগে শোনেনি। পান চিবোতে চিবোতে পান - দোকানি রামেরের পাশে বসে বিমলেশ কী গল্প করছিল বলুন দেখি সুকুমারদা?

সুকুমার কেমন বিহ্বল হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী গল্প? তার চট করে মনে হল আজ দুপুরের নিহত হওয়ার আগে বিমলেশ পাল হয়তো তার মার্কশিট, সার্টিফিকেট আর ক্যারেকটার সার্টিফিকেট না পাওয়া নিয়ে কথা বলছিল উৎকলবাসীর সঙ্গে। সে কী ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল সুকুমার দত্ত নামে সরকারি অফিসারের কাছে। মনে হতেইযাবে। এমনিতে রবিনের সঙ্গে তার এতক্ষণ পথে দাঁড়িয়ে কথা বলার ভিতরে স্বাভাবিকতা কম। সুকুমার তার পদের মেজাজটি বাড়িতে চৌহদ্দি থেকে বেরোলেই বজায় রাখতে চেষ্টা করে। চেষ্টা করতেও হয় না, অভ্যেস ফিরে আসবে যদি রবিন আবার...। একটি ছেলে হিসেবে তার একটু দাঁড়িয়ে খবরটা শোনা উচিত, তাই দাঁড়িয়েছে।

রবিন বিষণ্ণ মুখে বলল, বিমলেশ কোনোদিন সমুদ্র দ্যাখে নি সুকুমারদা, ও বলত যদি দ্যাখে পুরীর সমুদ্রই দেখবে, পুরীর সমুদ্রে অনেক ঢেউ, প্রায়ই রামের ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলত, আমিও শুনেছি আজকে নাকি সেই কথা।

কী কথা? সুকুমার অস্বস্তি হয়ে জিজ্ঞেস করে। রবিনের বুদ্ধি আছে। রবিন তো তার কাছে ঘোরে যদি কোথাও ঢুকিয়ে দিতে পারে সুকুমারদা। সুতরাং পুরোনো কথা আবার তুললে, কাজটা বোকামির হত। সুকুমার তো জানত না যে ছেলেটি ক্যারেকটার সার্টিফিকেট নিতে আসছে, না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে। সে এইভাবে খবর হয়ে উঠবে। নিহত হয়ে সকলের সহানুভূতি কেড়ে নেবে। সাহস বটে। এখন তো আর উপায় নেই যে ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দেবে সুকুমার। পাঁচ বছর না চিনেও দেবে। একেবারে না চিনেও দেবে। যা নিয়ে স্টেট ট্রান্সপোর্টে ওর চাকরি হয়ে যাবে।

রবিন বলছে বিমলেশকে রামের অনেক দিন বলেছে পুরীতে গেলে তার বিশেষ কোনো অসুবিধে হবে না। রামেরের গ্রাম - সম্পর্কে-কাকা পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরের পান্ডা। ঠিকানা নিয়ে চলে যাক বিমলেশ। সেই আলোচনাই হচ্ছিল। খুব সস্তায় থাকা, জগন্নাথ-দর্শন সমুদ্র-দর্শনের ব্যবস্থা করে দেবে পান - দোকানি রামের। তখন বোধহয় মোড়ের লালা জয়রামের দোকানে তিনটে ছেলে রিভলবার তুলে ঢুকে পড়েছে। দুপুরে তো এমনিতেই পথে লোক কম। লালাজিরও আলস্য ছিল। ওদিক দিয়ে হৈ হৈ কানে আসতে সিধে হয়ে বসেছিল বিমলেশ। ওই কদমগাছের নীচে দাঁড় করানো অ্যাম্বাস্যাডরের দিকে তারা ছুটে আসছিল। তখনো বোঝে নি কেউ। এই সময় পান- দোকানি দ্যখে মোড়ের মাথায় লালাজি বুক চাপড়াচ্ছে, তার দোকানের কর্মচারি ভোল চিৎকার করছে, ডাকাত - ডাকাত।

ডাকাতির এই অংশটা সুকুমার আগে শুনেছে। সমুদ্র দেখার কথাটা এই মাত্র শুনল। ভিন্ন সময়ে বলা দুটোঘটনা পরপর জুড়ে নিচ্ছিল সুকুমার। রবিন বলছে ও তো খুব ভীতু ছেলে সুকুমারদা। ও চাইছিল পান-দোকানি রামের ঠাকুর তার সঙ্গে চলুক! একা বউ নিয়ে পুরী কেন ডায়মন্ডহারবার যেতেও ওর ভয় করে।

আশ্চর্য! সুকুমারের ঠোঁট কাঁপল শুধু, শব্দটি যেন শীতের বাতাসেই লুকিয়েছিল কোথাও।

তাই তো বলছি, ওর ধারণা ছিল একা একা বউ নিয়ে কোথাও বেড়াতে গেলে হয়তো বউকে নিয়ে ফিরতেপারবে না, কোথাও যেন হয়েছিল এই ঘটনা, ও খবরের কাগজে পড়েছিল, তা থেকেই ধারণাটা বদ্ধমূল হলে গিয়েছিল, তাছাড়া...। রবিন থেমে গেল বলতে বলতে।

তাছাড়া কী? এবার সুকুমারের চোখে ফুটে উঠল বাক্যটি, শীতের বাতাস কথা খেয়ে নিল।

বিয়ের পর ব্যান্ডেল চার্চে বেড়াতে গিয়েছিল, ফেরার সময় নাকি কটি ছেলে ওর বউকে নানারকম ইঙ্গিত করে, একজন বোধহয় হাত ধরে টেনেও ছিল, আজ দুপুরে রামের আর ও বলেছিল কবে নাগাদ যাওয়া যেতে পারে, তখনই লালা জয়রাম আর তার কর্মচারি ভোলার চিৎকার, ঝপ করে উঠে দাঁড়িয়েছে বিমলেশ, রামের ওকে হাত ধরে টেনে বসাতে

চেয়েছিল, পারে নি।
তারপর? সুকুমার প্রায় আধ ঘন্টা পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও শুনতে চাইছিল নতুন করে। তার কৌতূহল এতক্ষণে তীব্র হয়েছে। রবিন ফিরে গেল রাম্মের আর বিমলেশের আলাপে। রবিন যত না ডাকাতির বিবরণ, বিমলেশের নিহত হওয়ার বিবরণ দিতে চাইছে, তার চেয়ে বেশি উৎসাহ ওর সেই আলাপের বিবরণে। সে বলছিল বিমলেশের ভয়টা তো মিথ্যে নয় সুকুমারদা। ওর আশংকার সায়ও দিত পান - দোকানি রাম্মের। পুরীতে যে অমন ঘটনা ঘটে নাতাও তো নয়। চারদিকে কে কেমন ঠিক চেনা যায় না। চেনে একমাত্র পুলিশ কিন্তু পুলিশ তো এসব কেসে পয়সা খেয়ে চেপে যায়। আর সেখানে বেড়াতে যায় মানুষ সেখানে তো থাকতে যায় না, লোকাল লোক যত পারে চুষে নিতেচায়। লোকাল লোকই-বা কেন, ও সব জায়গায় চারিদিক থেকে লোক আসে পয়সা রোজগারের ধান্ধায়, বরং লোকাল লোক ভালোই হয়। রাম্মের বলে জগন্নাথ ধাম অপবিত্র করে দিচ্ছে কিছু বদমাশ। সে নিজে সঙ্গে যাবে। সেসব কথার ভিতর তিনটে লোক ছুটে আসছিল অ্যাম্বাস্যাডরের দিকে। রাম্মের বলেছে তিনটেই যেন মূর্তিমান যম। দেখলেই ভয় করে। সে বিমলেশের হাত চেপে রেখেছিল, কিন্তু ধরতেই পারেনি কখন সেই হাত ছাড়িয়ে একলাফে রাস্তা পার হয়ে ছেলেটা জাপটে ধরেছে একজনকে। তার হাতে রিভলবার ছিল। বিমলেশ যেন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রিভলবারটা তার চোখে পড়ে নি। লোকটাকে বেড় দিয়ে এমনভাবে কদম গাছটার গায়ে ঠেসে ধরেছিল যে সে কিছু করতে পারছিল না। বোধহয় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এমন যে হতে পারে তা সে ভাবে নি। শেষে যখন দেখল পিছনথেকে লোক ছুটে আসছে সে গর্জন করে উঠেছিল, ছেড়ে দে বানচোত, মরে যাবি না হলে।
ছাড়ল না।
না, ছাড়লে তো মরত না, ডাকাতটার ভিতরে তখন ধরা পড়ার ভয় ঢুকে গেছে, সে আবার চিৎকার করেছিল, গুলি করব, ছেড়ে দে, শেষে ওর গলায় রিভলবার ঠেকিয়ে আর সময় নষ্ট করে নি, ঠাকুর স্পষ্ট দেখেছে সব,,তবে হ্যাঁ সে পালাতে পারে নি, অন্য দুটো অ্যাম্বাস্যাডরে করে পালিয়ে গেছে, গুলি করলেও বিমলেশ এমনভাবে ওর গলা চেপে ধরেছিল যে হাত থেকে রিভলবার পড়ে যায় এরপর, না হলে এলোপাথারি গুলি চালিয়ে আরো দু-একটা মারত। সে এখন মার খেয়ে হাসপাতালে। কী রক্তই - না পড়েছিল বিমলেশের, ফুটপাত লাল হয়ে গিয়েছিল।সেই রক্ত ধোয়া হল বিকেলে, এখন কিস্যু নেই, জল শুকিয়ে গেছে, পুলিশ আসার আগেই রাস্তা অবরোধ হল, পুলিশ অবশ্য বলেছে গভমেন্টের কাছে লিখবে, সাহসিকতার জন্য গভমেন্ট তো কী না কী পুরস্কার দেয়, লালাজি বলেছে টাকা মিললে পাঁচ হাজার দেবে। টাকা মিললে কেন? এমনিই তো দেওয়া উচিত। যদি টাকা না পাওয়া যায়?
পাওয়া গেছে, যার হাতে টাকা ছিল সেই তো ধরা পড়েছে, ঠিক লোককে ধরেছিল বিমলেশ, টাকাটা তো এখন পুলিশের হেফাজতে, কেসের এভিডেন্স। আশর্চ্য কী জানেন, লালাজির তো ডালডা ফ্যাক্টরি আছে বাগমারিতে, বিমলেশ চাকরির জন্যও ধরেছিল ওকে, লালা মাস ছয় ধরে শুধু ঘুরাচ্ছিল, একেবারে দয়ামায়হীন, দেবে না কিন্তু তা বলবেও না। আজ বলছে ওরকম ছেলে হয় না।
বউকে চাকরি দিক। সুকুমার অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে যা একেবারে ওর চরিত্রের বাইরে।
আমরা বলেছি, কিন্তু সেই এক কথা, ঝামেলা।
মিটুক আগে, শাস্তি হোক ডাকুর। এসব হল ঘোরানোর কথা, কী যে হবে!
সুকুমারের আর ভালো লাগছিল না। অনেকক্ষণ তো হল। সবই জানা হল। সে প্রসঙ্গ বদলাতে চেষ্টা করে, তুমি তখন কোথায় ছিলে রবিন।
রবিন তার সোয়েটার টানে নীচের দিকে, একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলল, পরে এসেছি, চক্রবর্তী বাড়িতে বউদি সিনেমার টিকিট কাটতে দিয়েছিল, ফেরার সময় দেখি আর জি কর হাসপাতালের কাছ থেকে বাস ঘুরছে বি টি রোডের দিকে, বেলগাছিয়া ব্রিজ বন্ধ, কী হয়েছে কেউ বলতে পারে না, বাস তো যাচ্ছে না, আসছেও না, হেঁটে এলাম ব্রিজটা, পাড়ায় ঢুকে দেখি এই ব্যাপার, বিমলেশকে তখন আর জি কর-এ নিয়ে গেছে। আমি তো হাসপাতালের পাশ দিয়েই এসেছি, কিছুই বুঝতে পারিনি, ছুটলাম আবার, পথেই মারা গেছে, বডি আর পাড়ায় আনতে দেয়নি পুলিশ, ওর মা- বউকে নিয়ে গেছে।
তুমি যাও নি?

বিকেলে আমার টিউশানি ছিল, আগের সপ্তায় দুদিন যেতে পারিনি, গিয়ে আর কী হবে সুকুমারদা, আমি সহ্য করতে পারতাম না, রামের গেছে, বিড়বিড়িয়ে বলল রবিন।

তবু একবার যেতে পারতে, তুমিই তো ওকে নিয়ে গিয়েছিলে আমার কাছে। বলেই ফেলল মাসে বারো দিন, আগের সপ্তা আর এ সপ্তায় তো তিনদিন বাদই গেল। আমি আর গেলাম না, টিউশানিটা তো রাখতে হবে। আমিযদি সিনেমার টিকিট না কাটাতে যেতাম ও হয়ত করত না, আমাকে পেলে ও নিশ্চয়ই পানের দোকানে বসত না,আমরা মাঠের রোদে বসতাম, রোববারও বসেছিলাম সারা দুপুর, ওর বউও ছিল, ওদের ঘরে তো রোদ ঢোকে না, আমাদেরও না, বাইরেটা আরামে।

সুকুমার এবার হাঁটতে থাকে। আশ্চর্য! রবিন তার সঙ্গে আসছে। সুকুমার এবার প্রসঙ্গ বদলাতে চায়, জিজ্ঞেস করল, কী সিনেমার টিকিট কাটলে?

রোজা, অবশ্য কালকের টিকিট, আজ হলে তো যেতে পারত না, চারতলা বাড়ির খুকুমণিরা আজ ম্যাড্রাসগেল, ঠিক একটু আগেই বেরিয়েছে, কোনো অসুবিধে হয়নি, কিন্তু সমীরদা আর বউদি যাবে রাউরকেল্লা, তখন পথঅবরোধ, বি টি রোড জ্যাম, কী অবস্থা! নিজেদের গাড়ি বলে যেতে পারল, লেকটাউন ঘুরে ভি আই পি উল্টোডাঙাহয়ে, বউদি তো কেঁদেই ফেলেছিল, বোনের ম্যারেজ সেটল হবে, না গেলেই নয়, ওরা ট্রেন পেয়ে গেছে, ড্রাইভারতো ছিল এখানে। বলতে বলতে রবিন ফ্যাকাশে পথের আলোয় এদিক - ওদিক দেখতে থাকে। ড্রাইভারকে যেন খুঁজতে থাকে। আসলে রবিনের কথা ফুরিয়ে এসেছে কিন্তু সুকুমারের সঙ্গ ছাড়তে চাইছে না, তাই অকিঞ্চিত বিষয়ে সুকুমারকে আটকে রাখতে চেষ্টা করছে।

সুকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, যাই, মানুষের প্রাণের কোনো দাম নেই এখন, জ্যান্ত ছেলেটা মরে গেল।

ঠিক বলেছেন দাদা, ঠিক আছে আপনি যান, কাল সকালে আমি যাব, বিমলেশের জন্য কিছু তো করা দরকার, একটা মিটিং

সুকুমার কথা শেষ করতে দিল না রবিনকে, মিটিং তোমরা করো, হ্যাঁ কিছু তো করতে হবে, কাল সকালে আমি বাইরে যাচ্ছি।

কেন, কাল তো ছুটি।

সুকুমার হাসে, ছুটি বলেই তো যাচ্ছি, আমরা বেরোব।

কোথায় যাবেন? রবিন জেরা করে।

বিরক্ত হয় সুকুমার, এভাবে জবাব দিতে সে অভ্যস্ত নয়, বলল, দূরে যাচ্ছি। কখন ফিরবেন?

কাল তো ফিরবই না, ফিরছি উনত্রিশে, বাইরে যাচ্ছি বললাম না।

রবিন গম্ভীর হয়, যেতেই হবে?

যেতে তো হবেই, ঝাড়গ্রাম যাচ্ছি। জবাব দিতে দিতে অবাক সুকুমার। রবিন স্পষ্ট জেরা করছে, আর সে প্রতিটির জবার দিচ্ছে ঠিকঠাক। সে তো এড়াতে পারছে না। রাগছে না রবিনের কথায়। সে জিজ্ঞেস করছে, কাজ আছে, খুব দরকারি?

সুকুমার এবার অসহিষ্ণু, কাজ তো বটেই, ইয়ার এনডিং, দুটো ছুটি মার গেল তবুও, কাজ আছে অফিসের, ঘুরেও আসব, ঝাড়গ্রামে তো একসময় আমি চাকরি করেছি, চমৎকার জায়গা, কাজের চাপে বেরনো হয়না।

সুকুমার তার কথার ভিতরেই শুনল রবিন বলছে, ঝাড়গ্রামে তার মাসির বাড়ি, যাওয়া তো খুব সোজা, কত ট্রেন, বাস, খড়গপুর পর্যন্ত যেতে পারলেই হল, তার জন্য সক্কালে বেরোতে হবে কেন, দুপুরে তো বম্বে এক্সপ্রেসওআছে।

না, না। মাথা ঝাঁকাতে থাকে সুকুমার, প্রোগ্রাম করা আছে, সকালে পৌঁছেই অফিসের মিটিং, পাড়ার মিটিং রবিনরা কক, চাঁদা যা লাগবে সে দিয়ে দেব পঞ্চাশ-একশো, বলতে বলতে সুকুমার একটু নরম গলায় জিজ্ঞেস করে, তোমার কোনো ইন্টারভিউ এল? তুমি কি কম্প্যুটার ট্রেনিং নিয়েছ?

মাথা নাড়ে রবিন। তখন সুকুমার বলে, কম্প্যুটার জানা থাকলে একটা ব্যবস্থা করা যেত, এটা কম্প্যুটারের যুগ।

রবিন স্থির হয়ে শোনে, সুকুমারের কথা শেষ হলে ধীরে বলে থিয়েটার রোডের কম্প্যুটার সেন্টারে ভরতি হতে চেষ্টা করেছিল সে, একশোটা সিট, অ্যাপ্লিকেশন পড়েছিল তিরিশ হাজার, হয় নি, আচ্ছা সুকুমারদা তিরিশ হাজারই যদি কম্প্যুটার শেখে সবাই চাকরি পেয়ে যাবে?

সুকুমার হাসে, এখন এটাই একমাত্র উপায়, জানি না সবাই পাবে কিনা।
কিন্তু কম্প্যুটার তো কাজের লোক কমাবে, সবাই কী করে পাবে চাকরি?
সুকুমার এবার সত্যিই বিরক্ত হল, অত ভাবতে হবে না তোমাকে, তুমি ট্রেনিংটা নাও, তিরিশ হাজারে একশোজনের মধ্যে যদি থাকো তো হবে, বেহালায় একটা ইনস্টিট্যুট খুলেছে, পারবে অতদূর যেতে?
পারব। রবিন আগ্রহ ভরে সুকুমারের কাছে চলে এল।
ফর্ম এনে অ্যাপ্লাই করে আমার সঙ্গে দেখা করো জানুয়ারির ফার্স্ট উইকে, দেখি কী করা যায়! সুকুমার হনহনিয়ে এগিয়ে যায়

।। দুই ।।

ঝাড়গ্রাম থেকে ফেরার পথে পাড়ায় ট্যাক্সি ঢুকলে চারদিন বাদে হত্যাকাণ্ডের কথা সুকুমারের মনে পড়ল গাছটি দেখে। ট্যাক্সির গতি ধীর, বনানীকে দেখালো সুকুমার, ওই গাছটার নীচে...
কী? চমকে উঠল বনানী।
ছেলেটা মরে গেল না গত হপ্তায়, যেদিন বেরোলাম তার আগের দিন।
বনানী মুখ ঘুরিয়ে নিল, চাপা গলায় বলল, আগে পাড়াটা বেশ ছিল, এখন যে দিন দিন কী হচ্ছে! সকালসন্ধে যখন বেরোও পার্কের রেলিং -এ চায়ের দোকানে পানের দোকানে দু-চারজন বসেই আছে, এমনভাবে তাকায়,বাবিটা বড় হচ্ছে। বলতে বলতে বনানী তার ঘুমন্ত মেয়ের কপালে হাত বুলোয়, বিড়বিড় করে, তাকিয়েই থাকে, দুপুরের পর বাবিকে আনতে একা যেতে হয়...কথা বিশেষ এগোয় না, বাবি জেগে উঠেছে, ট্যাক্সি পৌঁছেও গেছে। সুকুমার দেখল আগে তার বাড়ি অতিক্রম করে রবিন দূরে চলে যাচ্ছে। আর সামান্য আগে এলেই, এখনই দেখা হয়ে যেত।
রবিন এল আরো দিন সাতেক পরে। ছুটির সকালে, সঙ্গে আরো দুটি ছেলে। বিমলেশের পরিবারের জন্য চাঁদা তুলছে বেরিয়েছে। পঁচিশ টাকাই তো অনেক, সুকুমার তা বাড়াতেই রবিন ইতস্তত করে বলল, একশো টাকা দেবেন বলেছিলেন।
সেদিন নিলে না কেন? সুকুমার একটু রূঢ় হল, ভাবছিল রবিনের ওই অভ্যেসটাই খারাপ, এর আগেও দুবার চাঁদা নিয়েছে, ভূমিকম্পের পর, উত্তর বাঙলায় বন্যা সেসব বাদ দিয়েও। কার যেন মেয়ের বিয়ে, চাঁদা দিয়েছেসুকুমার, কার শ্রাদ্ধ, তাও চাঁদা। ঠিক জায়গায় টাকা পৌঁছোয় কিনা সন্দেহ। এসব করলে ও চাকরি - বাকরি করারটানই হারিয়ে ফেলবে। বোঝানো দরকার।
রবিন বলল, এর চেয়ে দূর্গাপূজো- কালীপূজোয় বেশি চাঁদ ওঠে দাদা।
সুকুমার বলল, যা দিচ্ছি নাও, ওগুলো হল উৎসব, বছরে একবার, এ হল শোক, বছরে শোকের তো বিরাম নেই, এর আগে কবার এসেছ বলো দেখি।
রবিন মুখ নামায় অপরাধীর মতো। সুকুমারের মায়া হল, জিজ্ঞেস করল, তুমি বেহালায় গিয়েছিলে, ফর্ম এনেছ কম্প্যুটার ট্রেনিং-এর?
মুখ তুলল রবিন, গিয়েছিলাম, ফর্ম আমি নি, আপনার মনে আছে সুকুমারদা।
বাহ্! মনে থাকবে না, কিন্তু ফর্ম আনো নি কেন? এসব করলে তোমার চলবে?
আড়াই হাজার টাকা অ্যাডমিশন ফি। বলতে বলতে রবিন পা বাড়ায়, ওবেলা আসব দাদা, আমার একটা ক্যারেকটার সার্টিফিকেট লাগবে। হাসে রবিন, হ্যাঁ, আমার, কাউকে ধরে আনছি নে, যাই!
রবিন ও বেলা আসে নি। পরের বেলাতেও না। সুকুমার তো ঘরের দরজা থেকে অফিসের গাড়িতে ওঠে, ঘরের দরজায় এসে নামে। দেখাই হয় না। দেখা হওয়ার কথা মনেই হয় না তার। মনে হবেই-বা কেন? শীত পাতলা হয়ে আসে শহরে। অনেক মানুষের গা থেকে সোয়েটার উধাও হয়ে যায়। বাস ট্যাক্সি ধুলো ওড়ায় খুব। এ-পাড়ার ভাঙা রাস্তায় সুকুমারের অফিসের গাড়িও কম ধুলো ওড়ায় না। কম পোড়া ডিজেলের গন্ধ ছড়িয়ে যায় না দুবেলা। এক রোববার সকালে সুকুমার বেরিয়েছে সিগারেট আনতে। রবিনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল উৎকলবাসীর দোকানেই। এককোণে বসে আছে সে। সুকুমার গিয়ে দাঁড়াতে হাত বাড়িয়ে চালু ক্যাটেস প্লেয়ারটা বন্ধ করে দিল। রবিন তাকে দেখে উঠে দাঁরিয়েছে। সুকুমার টাকা বাড়িয়ে ডাক দিল পান - দোকানিকে, উৎকলবাসী এক প্যাকেট ফিলটার উইল্‌স।

ঘুরে তাকায় রাম্মের, খীই -ই যে বলেন, বাবু, আমো কোলকাতাবাসী, আমো বঙ্গ বাসী, হেঁ হেঁ, উ রবিনদা কাঁই গেলে?
রবিন এখন সুকুমারের পাশে। সুকুমারকে চাপা গলায় ডাকল, দাদা, ওই যে।
কী! অবাক সুকুমার ভাঙাপথ পেরিয়ে তাক্যা
ওর মা, ওই যে ওপারে, কদমগাছের নিচে, বউ বাপের বাড়ি চলে গেছে।
সুকুমার দেখল ন্যুব্জদেহী বৃদ্ধা ওপার থেকে এপারে আসার চেষ্টা করছে। এপারে রবিন ধীরে ধীরে গিয়ে উৎকলবাসীর প াশে বসেছে আবার। রাম্মের বলছে, কবে যাইবে পুরী, জগন্নাথদেবের রথোযাত্রার যাইতে পার রবিনদা। মোর খুড়ার ঘর আছে মন্দির পাশে, পুরীর সমুদ্দার কী বড়ো, কী নীলা...
ওপারের বৃদ্ধা এখনো রাস্তায় নামনে পারে নি। কদমগাছ তাকে ছায়া দিচ্ছে। ছায়ার টান তো কম নয়। রোদ বেশ চড়া হয়ে গেছে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com